গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১৬ সংখ্যা | ২৯ নভেম্বর - ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা শবদেহে পরিণত

মহারাষ্ট্র নিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

বিজেপির নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকারকে মহারাষ্ট্রের গদিতে বসিয়ে দিতে যেভাবে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত দলত্যাগীদের কাজে লাগানো হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করেছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। ২৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, চূড়ান্ত স্বৈরতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা দখল করতে এবং সেই প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি, প্রথা সব কিছুকে দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতে বিপুল পরিমাণে টাকা ঢালা হয়েছে। এই ঘটনা আবার দেখিয়ে দিল শবদেহে পরিণত বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা আজ সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকে বিষাক্ত করে তুলছে। তিনি দেশের মানুষের কাছে এই ন্যক্কারজনক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজেপির গদি-লালসার বে-আব্রু প্রদর্শনী

ভোট প্রচারে যার দুর্নীতি নিয়ে সবচেয়ে সোচ্চার প্রচার করল কোনও দল, ভোটের পর তারই হাত ধরে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ! কী মনে হচ্ছে, দুর্নীতি, অনৈতিকতা? কিন্তু, বিজেপি প্রমাণ করেছে তাদের গদি দখলের অভিধানে এই শব্দগুলির অর্থ বদলে গেছে।

২২ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে ২৩ নভেম্বর ভোর পর্যন্ত চলা মহারাষ্ট্রের কুনাট্য দেখে অনেকেরই মনে পড়ে গেছে সোশাল মিডিয়াতে ঘোরা একটি রসিকতার কথা— এদেশের ভোটবাজ দলগুলির নেতারা 'জনসেবায়' এত উদগ্রীব যে, পার্টি ভোটের টিকিট না দিলে দল বদলে নেবে, তবু 'জনসেবার' সুযোগ ফসকাতে দেবে না!

মহারাষ্ট্রে এমনই 'জনসেবার' কারসাজি দেখিয়েছে বিজেপি। ২২ নভেম্বর গভীর রাতে এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারকে কব্জা করে ২৩ নভেম্বর ভোর হওয়ার আগেই তারা শপথ গ্রহণের সব ব্যবস্থা করে ফেলল। মহারাষ্ট্রের মানুষের দুঃখে কাতর বিজেপি এমন 'সার্জিকাল স্ট্রাইকটি' করল কার হাত ধরে? তাঁর অন্য পরিচয় বাদ থাক, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়া দেবেন্দ্র ফড়নবিস ভোটের সময় প্রতিটি জনসভায় মুম্বইয়ের বিখ্যাত ছবি 'শোলে'র ডায়লগ নকল করে বলতেন, একবার বিজেপি জিতলেই এই অজিত পাওয়ারকে কুচি কুচি করে কাটা হবে। তিনিই হয়েছেন ফড়নবিশ সাহেবের উপমুখ্যমন্ত্রী! শোনা যাচ্ছে অজিত পাওয়ারকে বাগে আনতে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের ফাইল

দুয়ের পাতায় দেখুন

অরণ্যের অধিকার রক্ষার দাবিতে

দিল্লিতে বিশাল সমাবেশ

বনাঞ্চলে আদিবাসী ও বনবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করতে 'ভূমি অধিকার আন্দোলনের' নেতৃত্বে ২১ নভেম্বর দিল্লির যন্তরমন্তরে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এআইকেকেএমএস-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন কমরেড জয়করণ মন্দাউথি। মঞ্চে সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন কমরেড অশোক কুমার সিং ও দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান।

'ফি কমাও, সবার শিক্ষার সুযোগ দাও'

জেএনইউ-এর পাশে ডিএসও

২৩ নভেম্বর ডিএসও সহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জেএনইউ-এর ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে ও সবার জন্য শিক্ষার সুযোগের দাবিতে পার্লামেন্ট অভিমুখে বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। আরও সংবাদ আটের পাতায়।

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে মানুষ

সরকার চরম উদাসীন

বাজারে আলু-পেঁয়াজ থেকে শুরু করে সবজির আগুন দাম। একটা বাঁধাকপি ৫০ টাকা, ফুলকপি ৪০, বেগুন ৭০ টাকা কেজি, জ্যোতি আলু এক কেজি ২২-২৫ টাকা, এমনকি লঙ্কা একশো গ্রাম ৮-১০ টাকা। বিপর্যস্ত মানুষ বাজারে গিয়ে নাজেহাল, থলেহাতে শুধু ঘুরছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু কিনে উঠতে পারছেন না। খাবার-পাতে তরকারির পরিমাণ কমতে কমতে প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। কী ভাবে দিন চালাবেন, সন্তান-পরিজনের মুখে পেটভরা খাবার তুলে দেবেন— এই দুশ্চিন্তা রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের। অথচ কী কেন্দ্র, কী রাজ্য সব সরকারই নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে।

এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির কারণ কী? এ বছর কি ফসল কম ফলেছে? আলুর ফলন কি কম হয়েছে? সাম্প্রতিক বুলবুল ঝড়ে কয়েকটি জেলায় ফসলের ক্ষতি হলেও গোটা রাজ্যে তো বিশেষ প্রভাব পড়েনি। বাস্তবে ফলনের ঘাটতি নয়, দামবৃদ্ধির পিছনে রয়েছে ফড়ে, আড়তদার, মহাজনদের কারসাজি আর তাদের মাথার উপরে থাকা সরকার ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত। তারাই বিপুল পরিমাণে কৃষিজ পণ্য চাষিদের কাছ থেকে কম দামে কিনে মজুত করে রাখে। চাষির খেতে নতুন আলু কিছুদিনের মধ্যেই উঠে যাবে। অথচ এখনও হিমঘরগুলিতে বিপুল পরিমাণ আলু জমে রয়েছে। মানুষ অবাক হয়ে দেখছে, হিমঘর খালি করার মেয়াদ ১৫ দিন বাড়িয়ে দিল সরকার। ফলে মজুতদাররা অল্প অল্প করে আলু বাজারে ছেড়ে দাম চড়া রাখছে। যে আলু চাষিরা ৩-৪ টাকা কেজি দরে বেচতে বাধ্য হয়েছে, সেই আলু বাজারে ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বিপুল মুনাফা ঘরে তুলছে মজুতদার, আড়তদার আর ফড়েরা। মার খাচ্ছে ক্ষুদ্র চাষি ও গরিব-মধ্যবিত্ত সাধারণ ক্রেতার দল।

এই বিপর্যয় সামাল দিতে যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা, 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন' প্রয়োগ করে কালোবাজারিদের গ্রেপ্তার করার কথা, সেখানে দেখা যাচ্ছে, দুই সরকারই অদ্ভুত ভাবে নীরব। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা ব্যস্ত গণতন্ত্রের সমস্ত রীতিনীতি পায়ে দলে যে কোনও উপায়ে গদি দখলের ষড়যন্ত্রে, কিংবা গোটা দেশে এনআরসি চালু করার হুমকি দিয়ে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে। পাশাপাশি,

দুয়ের পাতায় দেখুন

গদি-লালসার বে-আব্রু প্রদর্শনী

একের পাতার পর

খোলার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলিংয়ের পাশাপাশি নানা প্রলোভনের টোপ কাজে লাগিয়েছে বিজেপি। রাজনীতি শব্দটিতে যে 'নীতি' অংশটি জুড়ে আছে, সেটিকে দলের রাজনীতি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে বিজেপি। এই দলই এখন হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা সেজে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে, ধর্মের নাম নিয়ে ভোট চায়! সত্যিকারের ধার্মিক মানুষ এইসব বক-ধার্মিকদের ভণ্ড ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারেন কি?

ভোটে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। প্রথমে রাজ্যপাল তাদেরই সরকার গড়তে ডেকেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীত্বের কুর্সির ভাগাভাগি নিয়ে দরকষাকষি করতে করতে তাদের সাথে শিবসেনার জোট প্রক্রিয়া ভেস্তে যায়। ইতিমধ্যে বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। শিবসেনা, এনসিপি, কংগ্রেস মিলে জোটের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ২২ নভেম্বর বিকালে এই জোট জানায় সরকার গঠনের দাবি নিয়ে পরদিন তারা রাজ্যপালের সাথে দেখা করবে। কিন্তু ওইদিন গভীর রাত থেকে আসরে নেমে রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী এমনকী রাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত জড়িয়ে প্রায় অভ্যুত্থানের কায়দায় বিজেপির নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকার ভোরের মধ্যে গদিতে বসে পড়ল! স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, সারা রাত ধরে এমন প্রবল তৎপরতা, যাকে অনেকটা ক্যু-র (অভ্যুত্থানের) সাথেই তুলনা করা যায়, তার কী দরকার পড়ল? বিজেপির যদি সরকার গঠনের মতো এমএলএ সংখ্যা জোগাড় হয়ে গিয়ে থাকে তা নিয়ে রাজ্যপাল তো সকালেই বৈঠক করতে পারতেন। রাত দুটোর সময় রাজভবনে গিয়ে বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ দেখা করলেন রাজ্যপাল ভগৎ সিংহ কোশিয়ারির সাথে। রাজ্যপাল আবার আরএসএস এবং বিজেপির সক্রিয় কর্মী। এদিকে কখন রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহারের সুপারিশ রাজ্যপাল পাঠালেন, কখনই বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এই বিষয়ে তাদের সুপারিশ রাষ্ট্রপতি ভবনে পাঠালো, আর রাষ্ট্রপতিই বা কেন এতকিছুর জন্য জেগে বসে রইলেন, যাতে আলো ফোটার আগেই (ভোর পৌনে ছটায়) রাষ্ট্রপতির নির্দেশ দিল্লি থেকে বোম্বের রাজভবনে পৌঁছে যেতে পারে! এসবের কোনও উত্তর নেই। বিজেপি মুখপাত্র রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'রাজ্যপালের বিবেক আছে', তার ডাকেই তিনি সাড়া দিয়েছেন। কি অপূর্ব চিত্রনাট্য!

২৩ নভেম্বর দিল্লিতে রাজ্যপালদের সম্মেলনে তাঁদের সংবিধান রক্ষার উপদেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সেখানে যাননি। প্রধানমন্ত্রীর দলেরই গোপন অ্যাজেন্ডা মেনে সংবিধান, আইন, নীতি-নৈতিকতা সবকিছুকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পায়ে দলে যাওয়ার কর্তব্যের টানেই কি তিনি রাজভবন আগলে বসে ছিলেন? সংবাদমাধ্যম লিখেছে, 'মাঝরাতের এই অভ্যুত্থান জরুরি অবস্থাকেই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। কোথাও কোনও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। তা সত্ত্বেও কেন এত তড়িঘড়ি করে রাত দুটোর সময় দেবেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন রাজ্যপাল?... নেতাদের না হয় সরকার গড়ার জন্য নিশিলণ্ঠনের তেলপোড়ানোর দায় রয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক পদের দুই অন্যতম বয়স্ক ব্যক্তি রাত দুটোর সময় কেন জেগে?' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ মে ২০১৯)। প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিরোধী দলের নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর শপথে থাকেন, এটাই তো রীতি। কোথায় তাঁরা? রাজ্যপাল কী করে রাতেই সমস্ত বিধায়কের সই যাচাই করলেন? বিধানসভায় কত দিনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে, রাজ্যপাল সে ব্যাপারে নীরব কেন? আরও কিছু ঘোড়া কেনাবেচার পথ খুলে রাখতেই কি?

কিছুদিন আগে প্রায় একই রকম ঘটনা দেখা গেছে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের পর। কংগ্রেস-জেডিএস জোটের সরকারের পতন ঘটাতে এমএলএ-দের টাকা থেকে শুরু করে, মন্ত্রিত্বের টোপ এবং তাদের বিরুদ্ধে থাকা দুর্নীতির মামলা খুঁচিয়ে তোলার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেলিংয়ের অস্ত্র ব্যবহার করেছে বিজেপি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টও অনৈতিকভাবে দল ভাঙানোর জন্য স্পিকার যে ১৭ জন এমএলএ-র সদস্যপদ খারিজের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকে মান্যতা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পাকে (যাঁকে দুর্নীতির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল) বলতে শোনা গেছে, কর্ণাটকের গোটা অপারেশনটার দেখভাল করেছেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ (ইকনমিক টাইমস, ৫ নভেম্বর, ২০১৯)। এর আগে গোয়া বিধানসভা দখল করতেও ঠিক একই কায়দা নিয়েছিল বিজেপি। বিগত লোকসভা নির্বাচনেও আমরা দেখেছি, এই পশ্চিমবঙ্গেই বিজেপি এমন সব লোককে প্রার্থী করেছে, যাদের তারা ভোটের কিছুদিন আগেও মাফিয়া, অস্ত্রপাচারকারী ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করত।

আজ ভারতে এমন কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নেই যিনি বিজেপির এই উদগ্র ক্ষমতা লিপ্সার নিন্দা করছেন না। এক বাক্যে মানুষ বলছে অতি ন্যক্কারজনক এবং মারাত্মক দৃষ্টান্ত তৈরি করল বিজেপি। কিন্তু একই সাথে তাঁদের ভাবাচ্ছে, যে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, শিবসেনা, এনসিপি, জেডিএস ইত্যাদি দলগুলি ভোটের আগে বিজেপির দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাইছে, তাদের টিকিটে জেতা প্রতিনিধিরাই প্রলোভন অথবা দুর্নীতির তদন্তের ফাইল খোলার ভয়ে বিজেপিতে ভিড়ছে কী করে? সংসদীয় রাজনীতিতে এতটুকু নৈতিকতার বাষ্প থাকলেও কি এ জিনিস বিজেপির পক্ষে সম্ভব হত? নীতি-নৈতিকতা, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক বোধ নিয়ে রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদের পক্ষে কি এমন কাজ সম্ভব? একসময় কংগ্রেসই এই 'ঘোড়া কেনাবেচা' করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি শুরু করেছে। আজ বিজেপির টাকার থলির জোর বেশি বলে তারা বেশি কিনছে। টাকার জোরে তারা ইচ্ছা করলেই সেই এমএলএ-এমপিদেরও কিনছে যারা নির্বাচনী প্রচারে দুদিন আগেই তথাকথিত 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী', 'সেকুলার' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করেছেন। এমনকী বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলিও স্রেফ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানোর কারণেই কংগ্রেস, এনসিপি-র মতো দলগুলিকে একই আখ্যা দিচ্ছে! মহারাষ্ট্রের এই গদি দখলের ন্যক্কারজনক প্রয়াস দেখিয়ে দিল আজ বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র পরিণত হয়েছে এক শবদেহে, যে শবদেহের পচন আজ বিষিয়ে তুলছে গোটা সমাজকে। তার গায়ে জড়ানো অতীতের গণতন্ত্রের নামাবলিটুকুও পচে জীর্ণ হয়ে খসে পড়েছে। এই পচে যাওয়া ভোট-রাজনীতির পিছনে ছুটে জোট গড়ে তুলতেই হন্যে হয়ে ঘুরছে সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলি। ভোট-রাজনীতির এই কানাগলিতে ঘুরপাক খেয়ে যে সমাজ তথা রাজনীতিতে কোনও দিশা পাওয়া যাবে না, মহারাষ্ট্রের উদাহরণ তা দেখিয়ে দিল।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে হাওড়ায় মেডিক্যাল ক্যাম্প

২৪ নভেম্বর হাওড়ার শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেনের মেন গেটের সামনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় বোটানিকাল গার্ডেন ডেলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। এ দিন একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অশোক সামন্ত, ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ সাহেব চক্রবর্তী, ডাঃ রোকেয়া বেগম, ডাঃ অমল দত্ত, ওমপ্রকাশ সিংহ সহ সংগঠনের বিশিষ্ট সদস্যরা। শিবিরে উপস্থিত মানুষের সামনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে চিকিৎসকরা আলোচনা করেন।

আশাকর্মীদের সম্মেলন

সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, মাসে ১৮ হাজার টাকা বেতন সহ নানা দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করতে হাওড়া গ্রামীণ জেলার আমতা-২ নং ব্লকের আশাকর্মীদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৩ নভেম্বর। এর আগে ২৬ আগস্ট রাজ্যের ৩০ হাজার আশাকর্মী ১৩ দফা দাবি নিয়ে কলকাতার রাজপথ মুখরিত করেছিলেন এবং সরকারের কাছে তাদের দাবিপত্র পেশ করেছিলেন। কিন্তু আজও তাদের দাবি পূরণ হয়নি। সম্মেলন থেকে মুকুল রায়কে সভানেত্রী, পাপিয়া মাইতিকে সম্পাদিকা ও রুমা সাউকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৩ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

সরকার চরম উদাসীন

একের পাতার পর

রাজ্যের তৃণমূল সরকারের অবস্থাও অন্যরকম কিছু নয়। গত ১৩ নভেম্বর মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ জনজীবনের ১১ দফা দাবিতে এসইউসিআই(সি)-র নবান্ন অভিযানে বিপুল জনসমাগম লক্ষ করার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী দামবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে টাস্ক ফোর্সকে বাজারে ঘুরতে বললেন। এক শুভ সকালে মিডিয়া সঙ্গে নিয়ে টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা কলকাতার কয়েকটি বাজারে গিয়ে কিঞ্চিৎ হম্বিতম্বিও করে এলেন। সংবাদমাধ্যমে ফলাও প্রচার হল। মানুষ ভাবল এবার দাম কমবে। বাস্তবে দেখা গেল, গোটাটাই একটা প্রহসন। টাস্ক ফোর্সের কর্তারা যতক্ষণ বাজারে, ততক্ষণ সামান্য কম দামে বিক্রিবাটা চলল। তাঁরা বেরিয়ে যেতেই আবার যে কে সেই। প্রশাসন কি এ কথা জানে না? তাহলে কেন সরকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিচ্ছে না? কেন পুলিশ-প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে না বাজারে বাজারে আচমকা হানা দিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার ও ব্যবস্থা নেওয়ার? কেন সরকারে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে সক্রিয় হচ্ছেন না?

শুধু তাই নয়। মূল্যবৃদ্ধির পিছনে আসল কলকাঠি নাড়ে যে ফড়ে-মজুতদাররা, তাদের শাস্তি দিচ্ছে না কেন সরকার? আসলে বেআইনি মজুতদার ও কালোবাজারিদের সাথে সরকারি দলগুলোর আঁতাঁত বহু দিনের। বরাবর এরা এসব দলকে বিপুল টাকা জুগিয়ে আসছে। এই টাকার জোগান বন্ধ হয়ে গেলে নির্বাচনী প্রচারের আকাশছোঁয়া খরচের টাকা আসবে কোথা থেকে! তাছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও ফড়ে-দালালরাই বহু জায়গায় শাসক দলের ছোট-বড় কর্তা। এ হেন উপকারী বন্ধুদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের বেআইনি মুনাফালুট চৌপাট করে দেওয়া চলে কি? সেই কারণেই তাদের এই নিষ্ঠুর নীরবতা। জনজীবন মূল্যবৃদ্ধির আঁচে পুড়ে যাক, সমস্যায় জর্জরিত হয়ে শেষ হয়ে যাক, বছর বছর ফসলের দাম না পাওয়া আত্মঘাতী চাষির সংখ্যা বাড়তে থাকুক— এসবে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের কিছু যায় আসে না।

এই অবস্থায় এসইউসিআই(সি)-র দাবি, অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধে সরকারকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। ফড়ে-দালাল-মজুতদার রাজ নির্মূল করতে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন সহ সমস্ত আইন কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করে চাষিদের কাছ থেকে উপযুক্ত মূল্যে সরকারকেই ফসল কিনতে হবে। এই দাবিগুলি আদায়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণকে একজোট হওয়ার আবেদন জানিয়েছে এসইউসিআই (সি) দলের রাজ্য নেতৃত্ব।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে লেনিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য

অস্ত গিয়াছে প্রজ্ঞাদীপ্ত যুক্তির প্রভাকর
মহান হৃদয় স্পন্দনহারা স্তম্ভিত চরাচর
— (এন এ নেক্রাসভের কবিতার দুটি লাইন)

১৮৯৫ সালের ৫ আগস্ট (নতুন গণনারীতি অনুসারে) লন্ডনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের জীবনাবসান ঘটে। ১৮৮৩ সালে প্রয়াত তাঁর বন্ধু কার্ল মার্কসের পরে তিনিই ছিলেন সমগ্র সভ্য দুনিয়ার আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মহত্তম মনীষী ও শিক্ষক। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস— একই চিন্তাধারার অধিকারী এই দুই ব্যক্তিত্ব যেদিন ঘটনাচক্রে পরস্পর মিলিত হয়েছিলেন, সেদিন থেকেই অভিন্ন এক লক্ষ্যে অটুট বন্ধুত্বে এঁদের আজীবন অবিচল যাত্রার সূচনা হয়েছিল। এবং সেজন্যই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের অবদান সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে সমসাময়িক কালের শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের বিকাশে মার্কসের শিক্ষা ও কর্মধারার তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম দেখান যে, প্রচলিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের দাবিদাওয়াগুলির জন্ম হয়েছে, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অনিবার্যভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে সর্বহারা শ্রেণিরও জন্ম দেয় ও তাকে শিল্পভিত্তিতে একত্রিত করে দেয়। তাঁরা দেখান যে, কিছু মহৎ হৃদয় মানুষের শুভ কর্মপ্রচেষ্টা মানবসমাজকে বর্তমান শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না— সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামই একমাত্র এই মুক্তি সুনিশ্চিত করতে পারে। মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারধারার মাধ্যমে দেখালেন যে, সমাজতন্ত্র স্বপ্নবিলাসীদের কোনও কাল্পনিক উদ্ভাবন নয়, আধুনিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের চূড়ান্ত ও অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতিই হল সমাজতন্ত্র। আমাদের জানা (রেকর্ডেড) মানসবসমাজের এতাবৎকালের সমগ্র ইতিহাসই হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস— পর্যায়ক্রমে সমাজে কিছু শ্রেণির শাসন এবং তার বিরুদ্ধে শাসিত অপর কিছু শ্রেণির সংগ্রাম ও জয়লাভের ইতিহাস। এই সামাজিক প্রক্রিয়া ততদিন চলতে থাকবে, যতদিন সমাজের বুক থেকে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিপ্রভুত্বের মূল ভিত্তি ব্যক্তিসম্পত্তি ও বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যমূলক সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান না ঘটবে। শোষণ-নিপীড়নের এই সামাজিক ভিত্তিগুলির ধ্বংস ছাড়া সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থ পূরিত হতে পারে না এবং সে কারণেই সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির সচেতন শ্রেণিসংগ্রামকে এই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে। এবং প্রতিটি শ্রেণিসংগ্রামই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম।

বিশ্বব্যাপী যে সর্বহারা শ্রেণি মুক্তির জন্য লড়ছে, তারা সকলেই মার্কস ও এঙ্গেলসের এই বিচারধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের লড়াইয়ের মূল আদর্শগত ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে যখন এই দুই বন্ধু তৎকালীন সামাজিক আন্দোলনে অংশ নেন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দর্শন ও তত্ত্বগত রূপরেখাটি রচনার সংগ্রামে লিপ্ত হন, তখন তাঁদের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সকলের কাছেই আশ্চর্য রকমের নতুন বলে মনে হয়েছিল। সেদিন রাজার স্বৈরশাসন, পুলিশ ও পুরোহিতদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বহু মানুষই লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাধারণ মেধার মানুষ যেমন ছিলেন, অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষও ছিলেন। সৎ, ন্যায়পরায়ণ মানুষের পাশাপাশি অসৎ-মতলববাজরাও ছিল। কিন্তু তাঁদের কেউই, বুর্জোয়া শ্রেণি ও সর্বহারা শ্রেণির পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের সত্যটি ধরতে পারেননি। এঁরা ভাবতেই পারতেন না যে, শ্রমিকরা একটি স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসাবে সমাজে কোনও ভূমিকা পালন করতে পারে। বরং এঁদের মধ্যে এমন অনেক কল্পনাবিলাসী ছিলেন— যাঁদের কেউ কেউ প্রতিভাধর বলেও খ্যাত— যাঁরা মনে করতেন প্রচলিত সমাজের অন্যায় বৈষম্য সম্পর্কে ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণিগুলিকে বুঝিয়ে তাদের হৃদয় পরিবর্তন করাই আসল কাজ, তাহলেই পৃথিবীর বুকে শান্তি ও সর্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে। এঁরা এমন এক সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা সংগ্রাম ছাড়াই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেই সময় সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিক শ্রেণির বন্ধু বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রায় সকলেই সাধারণ ভাবে সর্বহারাদের

জন্ম ঃ ২৮ নভেম্বর, ১৮২০ মৃত্যু ঃ ৫ আগস্ট, ১৮৯৫

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কার্ল মার্কসের সুযোগ্য সহযোদ্ধা মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বিশত জন্মদিবস এ বছরের ২৮ নভেম্বর। এই উপলক্ষ্যে আমরা তাঁর সম্পর্কে মহান লেনিনের শ্রদ্ধার্ঘ্যটি এখানে প্রকাশ করলাম। আগামী এক বছর ধরে তাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী গভীর মর্যাদায় দলের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে পালিত হবে।

সমাজের 'ক্ষত' বলেই মনে করলেন এবং শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কী করে যে সর্বহারাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে যাচ্ছে, তা ভেবেই তাঁরা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হলেন। ফলে, কীভাবে শিল্পের ও সর্বহারার বিকাশ বন্ধ করা যায়, প্রায় সকলেই তার উপায় খুঁজতে লাগলেন। 'ইতিহাসের চাকা' কীভাবে থামিয়ে দেওয়া যায় এই ভাবনা তাঁদের পেয়ে বসল। মার্কস ও এঙ্গেলস কিন্তু এই উদ্বেগ ও আতঙ্কের আদৌ শরিক হলেন না, বরং সর্বহারা শ্রেণির নিরন্তর বিকাশের উপরই তাঁদের সকল আশা-ভরসা তাঁরা ন্যস্ত করলেন। শ্রমিক শ্রেণির মুক্তিসংগ্রামে মার্কস ও এঙ্গেলসের মহান অবদান ও ভূমিকাকে এক কথায় এইভাবে রাখা যায় ঃ তাঁরা শ্রমিকদের শ্রেণি হিসাবে নিজেদের চিনতে ও নিজেদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে শিখিয়েছেন। স্বপ্ন ও কল্পনার জায়গায়

মার্কস ও এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম তাঁদের বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারধারার মাধ্যমে দেখালেন যে, সমাজতন্ত্র স্বপ্নবিলাসীদের কোনও কাল্পনিক উদ্ভাবন নয়, আধুনিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের চূড়ান্ত ও অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতিই হল সমাজতন্ত্র।

তাঁরা বিজ্ঞানকে স্থাপনা করেছেন। এ কারণেই এঙ্গেলসের নাম ও জীবনের সঙ্গে প্রতিটি শ্রমিকের পরিচিত হওয়া অবশ্যপ্রয়োজন। তাই এই নিবন্ধের মধ্য দিয়ে আমরা আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির মহান দুই শিক্ষকের একজন— এঙ্গেলসের জীবন ও কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের সকল প্রকাশনার মতোই এই নিবন্ধেরও উদ্দেশ্য— রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে শ্রেণি সচেতনতা জাগ্রত করা।

এঙ্গেলসের জন্ম ১৮২০ সালে প্রুশিয়ার রাইনে প্রদেশের বারমেনে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ম্যানুফ্যাকচারার। ১৮৩৮ সালে, হাইস্কুলের পড়া শেষ করার আগেই এঙ্গেলসকে পারিবারিক অবস্থার চাপে ব্রেমেনে একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে কেরানির চাকরি নিতে হয়। কিন্তু সওদাগরি অফিসের কাজকর্ম এঙ্গেলসের কাছে বিজ্ঞান ও রাজনীতির নানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা হতে পারেনি। হাইস্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই এঙ্গেলসের মনে স্বৈরতান্ত্রিক রাজশাসন ও আমলাতন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মেছিল। দর্শনগত অধ্যয়ন তাঁর রাজতন্ত্রবিরোধিতাকে আরও গভীর করল। ওই সময় জার্মানিতে দর্শনচর্চার জগতে হেগেলের চিন্তার প্রভাব ছিল প্রবল। এঙ্গেলস ওই হেগেলরই অনুগামী হলেন। হেগেল নিজে যদিও প্রুশীয় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে প্রুশীয় রাষ্ট্রেরই কর্মচারী ছিলেন, তথাপি হেগেলের শিক্ষাগুলি ছিল বৈপ্লবিক উপাদানে সমৃদ্ধ। মানুষের যুক্তিবাদী মননশীলতার প্রতি হেগেলের আস্থা, যুক্তি দিয়ে সমস্ত বিষয় বুঝে নেওয়ার মানুষের অধিকারের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এবং হেগেলীয় দর্শনের যেটা মূল সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিবর্তন ও বিকাশের এক নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে— এই সমস্ত কিছুই হেগেলের কতিপয় অনুগামীকে— যাঁরা কোনও ভাবেই প্রচলিত অবস্থাকে মেনে নিতে রাজি ছিলেন না— এক নতুন ভাবনায় পৌঁছে দিল। হেগেলের দর্শনগত মূল সিদ্ধান্তকে ধরেই তাঁরা বললেন, সমগ্র বিশ্বজগৎ অনন্তকাল ধরে পরিবর্তিত ও বিকশিত হচ্ছে— এ সার্বজনীন নিয়মের মধ্যেই তো নিহিত আছে বর্তমানে বিরাজমান অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার, প্রচলিত সমাজের অন্যায়-অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সার্বজনীন সত্যটি। এই বিশ্বের সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ও বিকাশ হচ্ছে, এটাই যখন সার্বজনীন নিয়ম, এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিকাশের ধারাবাহিকতায় এক সময়ে এসে অন্য এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয়— এই যখন পরিবর্তনের বিশ্বজনীন প্রক্রিয়া, তখন প্রুশিয়ার রাজা বা রাশিয়ার জারের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা চিরকাল বহাল থাকবে কেন? গরিষ্ঠ জনসমষ্টির স্বার্থকে বিকিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে কেন মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যক মানুষ বিত্তশালী হবে অথবা জনসাধারণের উপর চিরকাল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেন?

হেগেলের দর্শন মানুষের মননের ও তার বিভিন্ন ভাবনা-ধারণার (আইডিয়া) বিকাশের ধারা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা ও মতামত দিয়েছে, কিন্তু তা ভাববাদী ব্যাখ্যা। মনন ও ভাবের বিকাশের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে, তাকেই নিয়ামক ধরে হেগেলীয় দর্শন প্রকৃতিজগৎ, মানুষ এবং মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির বিকাশ সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত করেছে। মার্কস ও এঙ্গেলস, হেগেলীয় দর্শনের চিরন্তন বিকাশের নিরন্তর প্রক্রিয়ার ধারণাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু হেগেলের পূর্বধারণাভিত্তিক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত (অর্থাৎ, ভাবের নিয়ামক ভূমিকাকে— অনুবাদক) বর্জন করলেন, বাস্তব জীবনের দিকে তাকিয়ে তাঁরা দেখলেন, মনন বা ভাবের বিকাশ দিয়ে প্রকৃতিজগতের বিকাশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, বরং প্রকৃতিজগৎ তথা বাস্তবজগতের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই একমাত্র মননের বা ভাবের বিকাশ ও গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। হেগেল ও অন্যান্য হেগেলপন্থীরা ছিলেন ভাববাদী, মার্কস ও এঙ্গেলস হলেন বস্তুবাদী। তাঁরা বিশ্ব ও মানবসমাজকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলির পিছনে যেমন বস্তুগত কারণ কাজ করছে, ঠিক তেমন ভাবেই মানবসমাজের বিকাশও বস্তুগত নানা শক্তি তথা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের উপর নির্ভরশীল (কন্ডিশন্ড্)। মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি উৎপাদন করতে গিয়ে একে অপরের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ মানুষের সঙ্গে কী সম্পর্কে আবদ্ধ হবে, তা উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের উপর নির্ভরশীল। এবং উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষে-মানুষে এই যে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, তার মধ্যেই নিহিত থাকে মানুষের সামাজিক জীবন, মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-ধারণা ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন সংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের যাবতীয় ব্যাখ্যা। এখন সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তির ভিত্তির উপর যেসব সামাজিক সম্পর্কগুলি আমরা দেখছি, তা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে, উৎপাদিকা শক্তির একই বিকাশ আবার সমাজের গরিষ্ঠ জনসমষ্টিকে তাদের নিজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে এবং সেই সম্পত্তিকে কুক্ষিগত করছে নগণ্য

চারের পাতায় দেখুন

মার্কস-এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব পুরাকাহিনীর সুন্দরতম নিদর্শনকেও ছাপিয়ে গেছে

তিনের পাতার পর

সংখ্যক মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে। উৎপাদিকা শক্তির এই বিকাশই আধুনিক সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি— ব্যক্তিসম্পত্তিকে অবলুপ্ত করবে, এই বিকাশই সম্পত্তি-বিলোপের সেই অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাইছে— যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসাধনে সমাজতন্ত্রীরা তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছে। এখন সমাজতন্ত্রীদের সর্বপ্রথম যেটা বুঝে নিতে হবে, তা হল, কারা সেই সামাজিক শক্তি, যারা আধুনিক সমাজে তাদের বিশেষ অবস্থানের জন্যই সমাজতন্ত্র কায়েম করতে আগ্রহী। এরপর যা করতে হবে তা হল, এই বিশেষ সামাজিক শক্তির মধ্যে তাদের নিজ শ্রেণিস্বার্থবোধ সম্পর্কে, তাদের ইতিহাস নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে। সর্বহারা শ্রেণিই হল এই সামাজিক শক্তি।

ইংল্যান্ডের সর্বহারা শ্রেণিকে এঙ্গেলস খোদ ম্যাঞ্চেস্টারে, ব্রিটিশ শিল্পের প্রাণকেন্দ্রে বসবাস করে খুব কাছ থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পান। ম্যাঞ্চেস্টারে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তাঁর বাবার কিছু শেয়ার ছিল। সেখানেই চাকরি নিয়ে ১৮৪২ সাল থেকে এঙ্গেলস বসবাস শুরু করেন। ওখানে এঙ্গেলস শুধু কারখানা-অফিসের কাজ নিয়েই থাকতেন না। সেই সমস্ত বস্তিতে ঘুরতেন যেখানে শ্রমিকরা ঘিঞ্জি ঝুপড়িতে অত্যন্ত দুর্বিষহ দিনযাপন করত। তিনি নিজের চোখে শ্রমিকদের দারিদ্র ও দুর্দশা দেখেছেন। কিন্তু শুধু নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার মধ্যেই তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাপনের যা কিছু তাঁর চোখে পড়ত, তা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, কিন্তু সাথে সাথে এই বিষয়ে সরকারি নথিপত্র যেখানে যতটুকু দেখার সুযোগ পেতেন, তাও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করতেন। এঙ্গেলসের এই পড়াশোনা ও পর্যবেক্ষণের ফল হিসাবেই ১৮৪৫ সালে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' প্রকাশিত হয়। এই বইটি লেখার মধ্য দিয়ে এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে কী অবদান রেখেছিলেন, সে বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি। এঙ্গেলসের আগেও বহু মানুষ সর্বহারা শ্রেণির দুর্দশার কথা লিখেছিলেন এবং এ-ও বলেছিলেন যে, সর্বহারাদের সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এঙ্গেলসই প্রথম, যিনি বললেন সর্বহারা শ্রেণি নিছক দুর্দশাভোগী একটি শ্রেণিমাত্র নয়। তিনি দেখালেন, এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থাই বাস্তবে, সর্বহারা শ্রেণিকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার পথে নিয়ে যাবে এবং শ্রেণি হিসাবে নিজেদের চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে তাদের বাধ্য করবে। এবং এই লড়াকু সর্বহারা শ্রেণি নিজেরাই নিজেদের সব থেকে বড় সহায়ক হবে। শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক আন্দোলনই শ্রমিকদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে এই উপলব্ধি ও চেতনা সঞ্চার করবে যে, তাদের মুক্তি একমাত্র সমাজতন্ত্রের মধ্যেই সম্ভব। অন্য দিকে, শ্রমিকদের এই উপলব্ধির ভিত্তিতে যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হবে, তখন সমাজতন্ত্র একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে। এটাই হল 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' বিষয়ে এঙ্গেলসের বইটির মূল চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারা আজ সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল ও সংগ্রামী সর্বহারারা তাদের সংগ্রামের মূল আদর্শগত হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যেদিন এঙ্গেলস এই বই লেখেন সেদিন এই চিন্তাধারা ছিল একেবারেই নতুন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় রচনাশৈলীতে ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণির জ্বালা-যন্ত্রণার অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই বইটিতে এঙ্গেলস এই চিন্তাধারা তুলে ধরেন। এ বই ছিল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে মানবতার দরবারে প্রকাশ্য অভিযোগের ভয়াবহ একটি দলিল এবং এর প্রভাবও পড়ল অত্যন্ত গভীরে। আধুনিক বাস্তব জীবনাবস্থার সব থেকে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সর্বত্রই এঙ্গেলসের বইটি উদ্ধৃত হতে লাগল। বস্তুত, শ্রমিক শ্রেণির দুঃখ-যন্ত্রণাময় জীবনের এমন হৃদয়স্পর্শী ও বাস্তবনিষ্ঠ ছবি— ১৮৪৪ সালের আগে ও পরে আর কোনও রচনাতেই পাওয়া যায়নি।

এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে আসার আগে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী হননি। ম্যাঞ্চেস্টারে বসবাসের সময় তিনি ইংল্যান্ডের তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত মানুষদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। ১৮৪৪ সালে প্যারিসে ফিরবার পথে মার্কসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল, যদিও ইতিমধ্যেই মার্কসের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান তাঁর চলছিল। মার্কসও ওই সময় প্যারিসে থেকে ফরাসি সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবে ও ফরাসি জীবনের সংস্পর্শে এসে একজন সমাজতন্ত্রীতে পরিণত হয়েছিলেন। এখানে দুই বন্ধু যৌথভাবে একটি বই লিখলেন, নাম দিলেন— 'পবিত্র পরিবার' অথবা 'সমালোচনামূলক সমালোচনার সমালোচনা' (হোলি ফ্যামিলি বা ক্রিটিক অফ ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক)। এই বইটি এঙ্গেলসের 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' শীর্ষক বইয়ের আগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর বেশিরভাগ অংশই মার্কসের লেখা। বৈপ্লবিক বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তিগুলি সম্পর্কেই এই বইয়ে আলোচনা করা হয়, যা উপরের আলোচনায় আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। 'পবিত্র পরিবার' নামটি আসলে দার্শনিক বলে খ্যাত বাওয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ও তাদের অনুগামীদের উদ্দেশ্য করে মার্কস ও এঙ্গেলসের দেওয়া একটা মজার নাম। এই ভদ্রোমহোদয়রা বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন, দল ও রাজনীতির ঊর্ধ্বে এমন এক সমালোচনা প্রচার করছিলেন— যার মধ্যে বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার কোনও স্থানই ছিল না। এরা চারপাশের জগৎ ও জাগতিক ঘটনাবলিকে কল্পলোকের উপাদান হিসাবেই 'খুঁটিয়ে' বিচার করছিলেন। এই বাওয়ার ভদ্রমহোদয়রা সর্বহারাদের যুক্তি-বুদ্ধি বিবর্জিত একটি জনসমষ্টি মনে করে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এই অবাস্তব ও ক্ষতিকারক চিন্তার বিরুদ্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। শাসক শ্রেণি ও রাষ্ট্রের দ্বারা অত্যাচারিত পদদলিত শ্রমিকদের এই সমাজেরই মানুষ হিসাবে দেখিয়ে তাঁরা বললেন, ভাববিলাস নয় এক উন্নততর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চাই। সাথে সাথে তাঁরা এও অবশ্যই বললেন যে, সর্বহারা শ্রেণিই এই সংগ্রাম গড়ে তুলতে চায় এবং তা গড়ে তোলার ক্ষমতাও তারা রাখে। এঙ্গেলস কিন্তু 'হোলি ফ্যামিলি' প্রকাশ হওয়ার আগেই মার্কস ও রুগে সম্পাদিত 'জার্মান-ফরাসি বর্ষ পত্রিকায়' তাঁর 'ক্রিটিক্যাল এসেস অন পলিটিক্যাল ইকনমি' নামে একটি লেখা প্রকাশ করেন। ওই নিবন্ধে এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক নানা অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং ওই সব ঘটনাকে ব্যক্তিসম্পত্তি ভিত্তিক প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল রূপেই দেখান। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পলিটিক্যাল ইকনমি (রাজনীতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সংযোগের আলোচনাত্মক বিজ্ঞান— অনুবাদক) বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য মার্কস যে সিদ্ধান্ত নেন, সেখানে এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের যোগাযোগের একটা ভূমিকা ছিল। পরবর্তী সময়ে পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ে মার্কসের অবদান এই বিজ্ঞানে যথার্থই বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল।

১৮৪৫ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত এঙ্গেলস ব্রুসেলস ও প্যারিস শহরে বাস করেন। এই সময় বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার সাথে সাথে ব্রুসেলস ও প্যারিসের জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজকর্মও তিনি চালাতে থাকেন। এখানেই মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মান কমিউনিস্ট লিগের গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই গুপ্ত লিগ তাঁদের বলে যে, সমাজতন্ত্রের মূল নীতি ও আদর্শ বিষয়ে তাঁদের চিন্তাধারা তাঁরা লিখিতভাবে পেশ করুন। এরই ফলশ্রুতিতে রচিত হয় মার্কস ও এঙ্গেলসের সুবিখ্যাত বই 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার', যা ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই ছোট্ট বইটি বিশাল রচনা সম্ভারের সমতুল্য। এই বইয়ের অমূল্য সত্য আজও গোটা সভ্য দুনিয়ার সংগঠিত ও সংগ্রামী সর্বহারা শ্রেণিকে প্রেরণা দেয়, পথ দেখায়।

১৮৪৮ সালে প্রথমে ফ্রান্সে যে বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ার দেখা দেয়, এবং পরে যা পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে, তা দেখে মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেদের দেশে ফিরে যান। এখানে, অর্থাৎ, রাইনিশে প্রুশিয়ায় বাস করে, তাঁরা কোলন থেকে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক পত্রিকা 'নিউ রাইনিশে জাইটুং'-এর দায়িত্বভার নেন। রাইনিশে প্রুশিয়ার জনগণের সকল বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে এই দুই বন্ধুর সমস্ত মন-প্রাণ একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। জনগণের স্বাধীনতা ও স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়ে এই দুই বন্ধু প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, শেষপর্যন্ত প্রতিক্রিয়াই জয়ী হয়। নিউ রাইনিশে জাইটুং-এর কণ্ঠরোধ করা হয়। মার্কস নির্বাসিত অবস্থায় তাঁর প্রুশীয় নাগরিকত্ব হারান এবং তাঁকে প্রুশিয়া থেকে বহিষ্কার করা হয়। এঙ্গেলস জনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশ নেন এবং তিনটি যুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করেন। বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর তিনি গোপনে সুইজারল্যান্ড হয়ে লন্ডনে চলে যান।

মার্কস ওই সময় লন্ডনেই বসবাস শুরু করেন। এঙ্গেলস অতি শীঘ্রই ম্যাঞ্চেস্টারের সেই প্রতিষ্ঠানে, যেখানে ৪০-এর দশকে তিনি কাজ করেছিলেন, আবার চাকরি নেন, পরে ওই প্রতিষ্ঠানেরই শেয়ারহোল্ডার হন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যাঞ্চেস্টারেই ছিলেন। এই সময় মার্কস থাকতেন লন্ডনে। কিন্তু বাইরের এই ব্যবধান দুই বন্ধুর মধ্যে আন্তরিক ও প্রাণবন্ত ভাববিনিময়ে কোনও বাধা হতে পারেনি। প্রায় প্রতিদিনই তাঁরা একে অপরকে চিঠি লিখতেন। এই সমস্ত চিঠিপত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরস্পরের বিশ্লেষণ, গবেষণা, সত্যোপলব্ধি ও আনুষঙ্গিক মতামতের আদানপ্রদান চলত। এইভাবেই দুই বন্ধু বৈজ্ঞানিক সমজতন্ত্রের দর্শন ও তত্ত্বগত বুনিয়াদ রচনায় এক নিরলস যৌথ সংগ্রাম চালিয়ে যান। ১৮৭০ সালে এঙ্গেলস লন্ডনে চলে যান— শুরু হয় দুই বন্ধুর সম্মিলিত জ্ঞানসাধনার এক সংকল্পদৃঢ়, কষ্টসাধ্য ও অধ্যবসায়ী জীবন। ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই যৌথ রাজনৈতিক জীবনে কোনও ছেদ ঘটেনি। মার্কসের দিক থেকে বিচার করলে এই যৌথ সংগ্রামের ফসল হল ক্যাপিটাল, যা পলিটিক্যাল ইকনমিতে আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রূপে ভাস্বর হয়ে আছে। আর, এঙ্গেলসের দিক থেকে ওই সময়কার তাঁর ছোট-বড় বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছিল ওই যৌথ সংগ্রামের ফসল। মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতির নানা জটিল দিকগুলি বিশ্লেষণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আর, এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোকে বিজ্ঞানের নানা জটিল প্রশ্ন, অতীত ও বর্তমানের নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিয়ে সহজ সাবলীল ভাষায় নানা রচনা লিখলেন— যার অধিকাংশই ছিল মতবাদিক সংঘর্ষমূলক। এঙ্গেলসের রচনাবলির মধ্যে অন্যতম হল ডুরিং-এর বিরুদ্ধে মতবাদিক বিতর্কমূলক আলোচনা (যেখানে তিনি দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ও সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে বিশ্লেষণ করেন), 'পরিবার, ব্যক্তিসম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি', 'লুডউইগ ফুয়েরবাখ' রাশিয়ার সরকারের বিদেশনীতি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ, আবাসন সমস্যার ওপর অসাধারণ কিছু প্রবন্ধ এবং সর্বশেষে বলব, রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর এঙ্গেলসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান দুটি প্রবন্ধের কথা। মার্কস পুঁজি সংক্রান্ত তাঁর সুবিশাল রচনায় শেষ আঁচড়টি দিয়ে যেতে পারেননি, আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য ক্যাপিটাল-এর খসড়া মার্কস সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন। ওই খসড়াকে প্রকাশের যোগ্য করে তোলা ও তা প্রকাশ করার কঠিন কাজ, বন্ধুর মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই কাঁধে তুলে নেন এবং ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। চতুর্থ খণ্ড প্রকাশে তাঁর মৃত্যু বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুটি খণ্ড সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেই এঙ্গেলসকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়। অস্ট্রিয়ার সমাজতন্ত্রী (সোস্যাল ডেমোক্রাট) আডলার ঠিকই বলেছেন যে, ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে এঙ্গেলস অনন্য প্রতিভাধর বন্ধুর প্রতি মর্যাদার এক বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছেন এবং ওই স্মৃতিস্তম্ভে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের নামটিও তিনি অম্লান অক্ষরে খোদিত করে গিয়েছেন। বাস্তবিক ক্যাপিটালের এই দুই খণ্ডের রচয়িতা হলেন দু'জন— মার্কস ও এঙ্গেলস। পুরাকাহিনীতে বন্ধুত্বের বহু হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়। ইউরোপের সর্বহারা শ্রেণি বলতে পারে— মুক্তিসংগ্রামে যে বিজ্ঞান তাদের হাতিয়ার, তা সৃষ্টি করেছিলেন এমন দুজন জ্ঞানী ও মহান যোদ্ধা— যাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক পুরাণ কাহিনীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম বন্ধুত্বের নিদর্শনকে ছাপিয়ে গেছে। এঙ্গেলস সবসময়ই নিজেকে মার্কসের পরে স্থাপনা করেছেন। সামগ্রিক বিচারে তিনি নিঃসন্দেহে ঠিকই করেছেন। পুরানো এক বন্ধুকে চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন— "মার্কসের জীবিতকালে আমি সর্বদাই তাঁর পাশে থেকে সহায়কের ভূমিকাই পালন করেছি।" জীবিত মার্কসের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও প্রয়াত মার্কসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অপরিমেয়। এই ইস্পাতদৃঢ় সংগ্রামী ও প্রজ্ঞাদীপ্ত চিন্তানায়কের হৃদয়ের আধারে ছিল গভীর মমতা ও ভালবাসা।

১৮৪৮-৪৯ সালের আন্দোলনের পর নির্বাসিত অবস্থায় মার্কস ও এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেই কেবল নিজেদের আবদ্ধ রাখেননি। ১৮৬৪ সালে মার্কস ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস্

পাঁচের পাতায় দেখুন

যুবকদের কাজের দাবিতে ডিওয়াইও-র উত্তর ২৪ পরগণা সম্মেলন

সকল বেকারের কাজ অথবা বেকারভাতা, মদ নিষিদ্ধ করা, নারীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ২৪ নভেম্বর শ্যামনগরের সারদা কুটিরে এআইডিওয়াইও উত্তর ২৪ পরগণা তৃতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শ্যামনগর স্টেশন থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে সম্মেলনস্থলে পৌঁছয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনের কাজ পরিচালনা করেন জেলা সম্পাদক কমরেড পতিতপাবন মণ্ডল। প্রতিনিধি অধিবেশনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর এবং প্রকাশ্য সমাবেশে এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রদীপ চৌধুরী ও সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামাণিক বক্তব্য রাখেন। কমরেড কৃষ্ণেন্দু নন্দীকে সভাপতি এবং গৌতম বিশ্বাসকে সম্পাদক করে ১৬ জনের জেলা কমিটি ও ১২ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিএসও-র সম্মেলন

শিক্ষার বেসরকারিকরণ-সাম্প্রদায়িকীকরণ, ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, জাতীয় শিক্ষানীতি-'১৯, সিবিসিএস-সেমেস্টার বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ১৯ নভেম্বর এআইডিএসও-র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস ইউনিটের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম। সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী কমরেড বন্দিতা পাত্র এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরাধা ওঝা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কলকাতা জেলা সভাপতি কমরেড সুমন দাস। কমরেড নির্মাল্য জানাকে সভাপতি এবং কমরেড শ্রাবন্তী সাঁফুইকে সম্পাদক করে ২০ জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে শ্রমিক সম্মেলন

শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন এলাহাবাদের রাজকীয় মুদ্রণালয়ের শ্রম হিতকারী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল ২১ নভেম্বর। বালিয়া, আজমগড়, মউ, জৌনপুর, প্রতাপগড় সহ বিভিন্ন জেলা থেকে নির্মাণ শ্রমিক, অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মী, পিতল শ্রমিক, রেল কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও ঠিকা কর্মী, সরকারি কর্মচারী সহ বিভিন্ন পেশার তিনশোরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের শুরুতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কমরেড ধর্মদেব ও কমরেড লতা শর্মা দুটি প্রস্তাব পেশ করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা প্রস্তাবদু'টি নিয়ে আলাপ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। কাজ পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার ঘোষণা, ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা করা, ঠিকাকর্মীদের স্থায়ীকরণ, সরকারি সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ বন্ধ করা সহ ১৩ দফা দাবির সমর্থনে সম্মেলনে আওয়াজ ওঠে। পাশাপাশি আগামী ৮ জানুয়ারি সারা ভারত শ্রমিক ধর্মঘট সফল করার শপথ গ্রহণ করেন উপস্থিত শ্রমিক-কর্মচারীরা।

এদিন প্রথমে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিজয় পাল সিং। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিংহ। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দেশে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় একের পর এক সরকার কীভাবে শ্রমিকবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। এই অবস্থার পরিবর্তনে শ্রমিক আন্দোলন জোরদার করার পাশাপাশি পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান তিনি।

সম্মেলন পরিচালনা করেন কমরেড রাজবেন্দ্র সিংহ। সম্মেলন থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণে

চারের পাতার পর

অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং এক দশক ধরে এই সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। মার্কসের চিন্তাধারায় বিশ্বের সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ওই আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেয়। বস্তুত শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন গড়ে তোলার ইতিহাসে এই আন্তর্জাতিকের ভূমিকা ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। সত্তরের দশকে এই আন্তর্জাতিক বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে শ্রমিক শ্রেণিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের ভূমিকা শেষ তো হলই না, বরং বলা যায়, বিশ্ব সর্বহারার পথপ্রদর্শক রূপে তাঁদের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পেল। কারণ সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলন তখন দেশে দেশে অপ্রতিরোধ্য গতিতে গড়ে উঠেছিল। মার্কসের মৃত্যুর পর একা এঙ্গেলসই ইউরোপের সর্বহারা শ্রেণির নেতা ও শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করলেন। তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশকে পাথেয় করেই সমগ্র দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা এগিয়ে চললেন। জার্মানিতে তখন সরকারি উৎপীড়ন সত্ত্বেও, সমাজতন্ত্রীদের শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আবার স্পেন, রুমানিয়া ও রাশিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতেও তখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ছড়িয়েছে, ধাপে ধাপে আন্দোলনের সূচনাও ঘটেছে। এই সমস্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা তখন পথনির্দেশের জন্য এঙ্গেলসের কাছেই গেলেন। পরিণত বয়সে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত এঙ্গেলস তখন দুনিয়ার সকল সমাজতন্ত্রীদের কাছেই এক প্রবল আকর্ষণ।

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই রুশ ভাষা জানতেন ও রুশ বই-পত্র পড়তেন। এই দেশ সম্পর্কে তাঁদের দুজনেরই আন্তরিক আগ্রহ ছিল। রুশ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি তাঁরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ করতেন এবং রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের পথ ধরেই এই দুই মনীষী সমাজতন্ত্রী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক বোধ তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র ছিল। এক দিকে এই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অনুভূতি, অন্যদিকে রাজনৈতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিষয়ে সুগভীর তত্ত্বগত উপলব্ধি ও তার সঙ্গে জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতার সমন্বয় মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়কেই অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার অধিকারী করেছিল। এ কারণেই প্রবল শক্তিধর জারের বিরুদ্ধে রুশ বিপ্লবীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এই দুই পরীক্ষিত বিপ্লবীর মহান হৃদয়ে গভীর আশা ও সহানুভূতির সৃষ্টি করেছিল।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আশু যে কাজটি রুশ বিপ্লবীদের সামনে রয়েছে, কিছু আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করার মিথ্যা মোহে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সেই সংগ্রামকে অবহেলা করার যে প্রবণতা, তাকে তাঁরা স্বভাবতই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন এবং এই প্রবণতাকে তাঁরা সমাজবিপ্লবের মহান উদ্দেশ্যের প্রতি সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সমগ্র জীবন ধরে বারবার আমাদের শিখিয়েছেন যে, "শ্রমিকদের মুক্তি শ্রমিক শ্রেণিকেই সংগ্রাম করে অর্জন করতে হবে— অপরে তাদের মুক্তি এনে দেবে না।" কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণের জোয়াল থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করার প্রয়োজনেই সর্বহারা শ্রেণিকে কিছু রাজনৈতিক অধিকার জয় করে নিতে হবে। আমাদের আরও জানা দরকার যে, রুশ দেশের মাটিতে রাজনৈতিক বিপ্লব পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনে কী তাৎপর্যময় প্রভাব ফেলবে— মার্কস ও এঙ্গেলস তাও অত্যন্ত পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন। স্বৈরতান্ত্রিক রাশিয়া হল সাধারণভাবে সমগ্র ইউরোপের প্রতিক্রিয়ার দুর্গ। ১৮০৭ সালের যুদ্ধের ফলে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থা পেয়ে যায়— যা প্রতিক্রিয়ার শিবিরে স্বৈরতান্ত্রিক রাশিয়ার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ইউরোপে প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খল ভাঙতে হলে চাই মুক্ত রাশিয়া। এই মুক্ত রাশিয়া — যে কোনও কারণেই পোলিশ, ফিনিশ, জার্মান, আর্মেনিয়ান বা অন্য কোনও ক্ষুদ্র জাতির ওপর নিপীড়ন চালাবে না— এই ধরনের পীড়ন চালানোর অথবা জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে সর্বদা বিরোধ বাধিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজনই যে রাশিয়ার হবে না, একমাত্র সেই রাশিয়াই আধুনিক ইউরোপকে যুদ্ধের দুঃসহ বোঝা থেকে মুক্ত করে এই শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ দূর করতে পারে। একমাত্র মুক্ত রাশিয়াই পারে ইউরোপের সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মদমত্ততাকে খর্ব করে ইউরোপীয় সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে। সমগ্র পশ্চিমে শ্রমিক আন্দোলনের এই অগ্রগতির স্বার্থেই এঙ্গেলস রাশিয়ায় জার শাসনের অবসান ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এত আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে রুশ বিপ্লবীরা তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারাল।

সর্বহারা শ্রেণির মহান যোদ্ধা ও শিক্ষক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে আমরা সর্বদা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় স্মরণ করব।

(এই নিবন্ধটি লেনিন ১৮৯৫ সালে লেখেন। 'রাবোস্টনিক' পত্রিকায় ১৮৯৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়। লেনিন রচনাবলী ২য় খণ্ড, মস্কো-১৯৬০)

দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে সারা বছর ধরে মহান এঙ্গেলসের ১) সাম্যবাদের মূলনীতি, ২) সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক, ৩) প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা গ্রন্থের ভূমিকা, এই তিনটি রচনা পাঠ ও চর্চার জন্য দলের পক্ষ থেকে নেতা-কর্মী-সমর্থক ও শ্রমজীবী মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস দীর্ঘদিন ফুসফুসের রোগে অসুস্থ থাকার পর ১৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটায় টালা পার্টি সেন্টারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

এদিন সকালে হঠাৎই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এই সংবাদ পেয়েই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী, কমরেড স্বপন ঘোষ, কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং তরুণ কর্মীরা সেন্টারে ছুটে যান।

আকস্মিক এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই পার্টির সর্বস্তরে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজ্য, জেলা ও লোকাল অফিসগুলিতে পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। নেতা-কর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ওই দিন মরদেহ পিসওয়ার্ল্ডে সংরক্ষণ করা হয়। পরদিন ১৯ নভেম্বর প্রথমে মরদেহ অ্যাবেকা অফিসে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তারপর দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রক্তপতাকায় সজ্জিত তাঁর মরদেহ বেলা বারোটা থেকে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রাখা হয়।

তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটবুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড গোপাল কুণ্ডু, কমরেড সৌমেন বসু এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতির পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ, জেলা ও আঞ্চলিক কমিটির প্রতিনিধিরা। তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা ও যে সমস্ত সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন তার প্রতিনিধিরাও মাল্যদান করেন।

কালীঘাটের ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমিতে পড়াকালীন এআইডিএসও-র নেতা কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলীর সাথে তাঁর পরিচয় হয় ছাত্র সংগঠক কমরেড মুকুন্দ ঘোষের মাধ্যমে। কালীঘাটের চন্দ্র মণ্ডল লেনের বস্তিতে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি বড় হয়েছেন। খেলাধূলাতেও তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। খুব ভাল ফুটবল খেলতেন। তখনকার ফার্স্ট ডিভিশন টিম 'ভ্রাতৃসংঘ'-তে জুনিয়র ডিভিশনে নিয়মিত গোলকিপার ছিলেন তিনি।

১৯৬২-তে আশুতোষ কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন কমরেড বিশ্বাস। আশুতোষ কলেজের ছাত্র সংসদ তখন পরিচালিত হত এআইডিএসও-র নেতৃত্বে। সে সময় ছাত্র আন্দোলনের নেতা কমরেড প্রভাস ঘোষ (বর্তমানে পার্টির সাধারণ সম্পাদক) দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ছাত্রের কাছে এআইডিএসও-র সদস্য হওয়ার যে আহ্বান রেখেছিলেন, তাতে সাড়া দিয়ে আরও অনেক ছাত্রদের সাথে কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস এগিয়ে আসেন। এ সময়েই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন তিনি।

আশুতোষ কলেজ তখন এ রাজ্যের ছাত্র আন্দোলনের প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যান্য কলেজেও এর প্রভাব পড়েছিল। আশুতোষ কলেজে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দুর্নীতি ও হঠাৎ করে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে ও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই আন্দোলনে জুনিয়র ছাত্রদের মধ্যে কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস ছিলেন অগ্রণী। আন্দোলনে ক্ষিপ্ত হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে বেছে বেছে সাতজন সংগঠককে

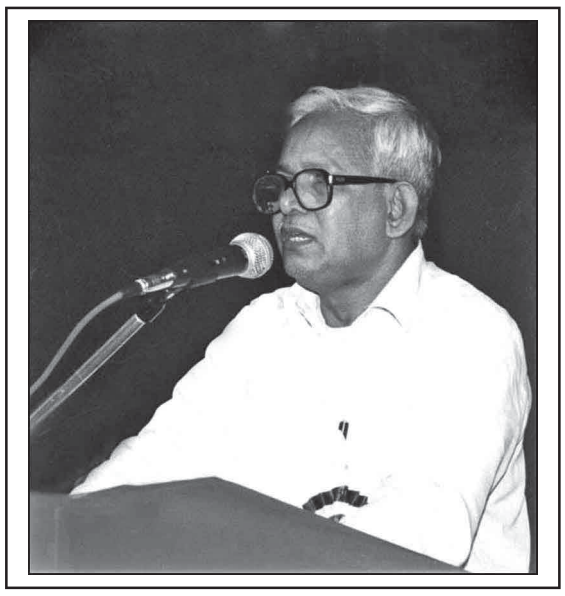

বহিষ্কার করে, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস। ওই সময়ে ডিএসও সংগঠক কমরেড মুকুন্দ ঘোষ চারুচন্দ্র কলেজে একটি ডিএসও ইউনিট গঠন করেন। ১৯৬৪-'৬৫ নাগাদ তাঁর প্রচেষ্টায় চারুচন্দ্র কলেজে স্নাতক স্তরে কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস ভর্তি হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। '৬৫-'৬৬ সাল নাগাদ তিনি ওই কলেজের ডিএসও পরিচালিত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন। বহু সময়ে একাই সেখানে নানারকম বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হয়েছে। বহুবার প্রতিপক্ষের হাতে মারও খেয়েছেন, কিন্তু কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলেজ গেটে থেকে ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করতেন। তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ রাখতেন। চারুচন্দ্র কলেজের পাশে লেক প্লেসের একটি তিনতলার চিলেকোঠা ঘরে যেতেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস ছাত্রদের সেখানে নিয়ে যেতেন, ছাত্রদের কমরেড প্রভাস ঘোষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। সেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। আশুতোষ কলেজ হস্টেলেও কমরেড প্রভাস ঘোষ ছাত্রদের নিয়ে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক ক্লাস করতেন। কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস ছাত্রদের সেখানে পাঠাতেন।

পরবর্তীকালে কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে অধিকতর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন তিনি। তিনি ডিএসও-র উত্তর কলকাতা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ সালে বহরমপুর ও ১৯৭৮ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে দু'বার তিনি এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। শুধু ছাত্র সংগঠন নয়, পার্টির নানা সাংগঠনিক দায়িত্বও তিনি রাজ্য স্তরে ও নানা জেলায় পালন করেছেন। পার্টি যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কখনও তা পালনে দ্বিধা করেননি। ১৯৭৪ সালে কটকে ডিএসও-র সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য যে টিম পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওখানে গিয়ে কাজ করেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস। পার্টি পরিচালিত সকল গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎচালিত লেদ, ধানকল, গমকল সহ সমস্ত ক্ষুদ্রশিল্পে বিদ্যুতের দাম এক ধাক্কায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। রাজ্য জুড়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ, ক্ষোভ, বিক্ষোভ দেখা দেয়। কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসকে পার্টি এই নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়। এর ভিত্তিতে ১৯৯২ সালের ৭ এপ্রিল কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলীকে সভাপতি ও কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসকে সম্পাদক করে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) গঠিত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটারি কমিশনের অ্যাডভাইসারি বোর্ডের সদস্য এবং অ্যাবেকার সভাপতি। বিদ্যুৎ মাশুল এবং গ্রাহকদের সমস্যা সঠিকভাবে বোঝা ও আইনি নানা বিষয়ে সঠিক রাস্তা দেখানোর ক্ষেত্রে বহু পরিশ্রম করে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই এ রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বহু দাবি আদায় হয়। এর মধ্য দিয়েই তিনি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আস্থা অর্জন করেন, নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

২০০৯ সালে শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির সদস্য হন তিনি এবং রাজ্য সাব কমিটির কনভেনরও ছিলেন। কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস স্বভাবগত ভাবে অত্যন্ত সৎ, পরিশ্রমী, সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দায়িত্বশীল ছিলেন। জুনিয়র কর্মীদের স্নেহ করতেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসতেন, তাদের খোঁজখবর নিতেন। তত্ত্বগত বিষয়েও তাঁর উৎসাহ ছিল। পার্টির পত্র-পত্রিকা, বই খুঁটিয়ে পড়তেন। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি পরিবারের জন্য চাকরি করার পথ গ্রহণ না করে কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রেরণায় সর্বক্ষণের কর্মীর জীবন গ্রহণ করেন।

কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস দীর্ঘদিন ফুসফুসের সংক্রমণে আক্রান্ত ছিলেন। ২০১৪ সালে গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করতে হয়। এরপর কয়েকবার তিনি অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছেন। চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টা ও নিজের অদম্য মনোবলে তিনি বেঁচে উঠেছেন। এক দফায় টানা তিন মাস তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। শ্বাসকষ্ট লাঘবের জন্য দীর্ঘ সময় অক্সিজেন কনসেনট্রেটর মেশিনের সাহায্য নিতে হত তাঁকে। অসুস্থতার নানা উপসর্গ বাড়ছিলই। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতোই তাঁকে চলতে হত। ১৭ নভেম্বর রাতে তাঁর জ্বর হয়, শ্বাসকষ্ট বাড়ে। পরদিন সকালে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। তাঁকে হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই তিনি সংজ্ঞা হারান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ডাক্তার ডেকে আনলে তিনি জানান কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস আর বেঁচে নেই। হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল থেকে ডাক্তার এসেও একই কথা জানান।

মৃত্যুর পূর্বেই দেহদানের ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর করে রেখেছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় অফিসে উপস্থিত নেতা-কর্মী-সমর্থকবৃন্দ অর্ধনমিত রক্তপতাকা হাতে নিয়ে শববাহী গাড়িকে সামনে রেখে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে যান। তাঁর ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে অ্যানাটমি বিভাগের কর্তৃপক্ষের হাতে তাঁর মরদেহ তুলে দেওয়া হয়। দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক শুভানুধ্যায়ীরা চোখের জলে তাঁকে লাল সেলাম দিয়ে বিদায় জানান। কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসের মৃত্যুতে দল একজন সৎ, পরিশ্রমী ও অত্যন্ত দায়িত্বশীল নেতাকে হারাল। গণতান্ত্রিক আন্দোলন হারাল একজন জনদরদি দক্ষ সংগঠককে। ৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪ টায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁর স্মরণসভা।

কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস লাল সেলাম

পাঠকের মতামত

মিছিলের ছবি

জনজীবনের সমস্যাগুলো নিয়ে আপনাদের দলের ডাকে ১৩ নভেম্বর কলকাতায় যে মিছিল সংগঠিত হল, তা যারা দেখেছে তারা আমার মতোই আপ্লুত হয়েছে তার বিশালতায় এবং সুশৃঙ্খলায়। আনন্দবাজার পত্রিকাও তার রিপোর্টে মন্তব্য করেছে, 'হেদুয়া পার্ক থেকে মিছিলে ভিড় হয় বিপুল।' কিন্তু সেই মিছিলের যে ছবি গণদাবীতে ছাপা হয়েছে তাতে ব্যাপক জনসমাগম অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে ব্যানার-প্ল্যাকার্ডে।

মিছিলে জনতার দাবি-সম্বলিত ব্যানার-প্ল্যাকার্ড অবশ্যই দরকার, তবু আমার মনে হয়, সেগুলি এমন ভাবে সাজানো দরকার যাতে ক্যামেরার ছবিতে মিছিলের বিশালতা দৃশ্যমান হয়। যাঁরা এই মিছিল সরাসরি দেখেননি তাহলে তাঁরা ছবির মাধ্যমে মিছিলের বাস্তবতার ধারণা পেতে পারবেন।

নির্মল সাধুখাঁ, কলকাতা ১২

পাশ-ফেল চালু ও মূল্যবৃদ্ধি রোধে আগরতলায় ধরনা

১৯ নভেম্বর ত্রিপুরার আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে ৯ দফা দাবিতে ধরনায় বসে এস ইউ সি আই (সি)। প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু, অত্যাবশ্যকীয় জিনিস-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি রদ, মদ নিষিদ্ধ করা, ধর্ষণ ও হত্যায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি, রিয়াং শরণার্থীদের সমস্যা সমাধান সহ নানা দাবিতে ধরনায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেডস শিবানী ভৌমিক, সুব্রত চক্রবর্তী এবং সঞ্জয় চৌধুরী।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৮)

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের লড়াই ছিল এ দেশের মাটিতে পার্থিব মানবতাবাদের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার। এ কাজে তিনি যেমন প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন, আবার একই সাথে সে যুগের চিন্তাশীল বহু মানুষকে পেয়েছেন সহযোদ্ধা রূপে। অক্ষয় কুমার দত্ত সেই সহযোদ্ধাদের মধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তেমন না থাকলেও কঠোর পরিশ্রম করে সেযুগে জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এই কঠোর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল সত্যানুসন্ধান। অন্ধতা-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে যুক্তি ও জ্ঞানের আলো জ্বালাবার যে উদ্যোগ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সংহত রূপ পেয়েছিল, তার অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রায় সাত-আটটি ভাষা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি শিখেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবে তিনি ব্রাহ্ম পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শ চর্চার জন্য ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভা। সেই সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ শুরু হলে অক্ষয় দত্ত তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। যদিও পত্রিকার লেখাপত্র নির্বাচনে চূড়ান্ত অনুমোদন দিতেন দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনন্দকৃষ্ণ বসু। অক্ষয় দত্ত তাঁর কাছে লেখার পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসতেন। আনন্দকৃষ্ণ সেগুলি দেখে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে তাঁকে ফেরত দিতেন।

একদিন আনন্দকৃষ্ণের ফেরত দেওয়া ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি দেখে খুব অবাক হলেন অক্ষয় দত্ত। অনুবাদটি তাঁরই করা। তিনি দেখলেন, সেটির বেশ কয়েকটি জায়গায় পরিবর্তন এবং সংশোধন করা হয়েছে, যার ফলে অনুবাদটি আরও প্রাঞ্জল ও কার্যকরী হয়ে উঠেছে। আগেও তিনি এধরনের অনুবাদ করেছেন এবং আনন্দকৃষ্ণ সেগুলি দেখেছেন কিন্তু তেমন কোনও সংযোজন-বিয়োজন করেননি। তাহলে এবারে এগুলি করল কে? কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন, 'সংশোধনগুলি কি আপনি করেছেন?' আনন্দকৃষ্ণ বললেন, 'না। ওটা দেখতে দিয়েছিলাম বিদ্যাসাগরকে। ওই করেছে'। অক্ষয় দত্তের সঙ্গে তখনও বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়নি। কিন্তু ওই সংশোধনগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগরের সাবলীল ভাষা ও নিখুঁত জ্ঞানের কিছুটা পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের থেকে অক্ষয় দত্ত বয়সে মাস-দুয়েকের বড়। কিন্তু মনে মনে তাঁকেই নিজের অগ্রজ বানিয়ে ফেললেন এবং আলাপ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে আনন্দকৃষ্ণের কাছে যেতেন বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়র পড়তে। এখানেই একদিন তাঁর সাথে পরিচয় হল অক্ষয় দত্তের। সেই থেকে তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিনিময়, আলাপ-আলোচনার শুরু। এর মধ্য দিয়েই ক্রমে দু'জনের বন্ধুত্ব এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেই বন্ধুত্বের রূপান্তর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধায়। বাংলা ভাষা ও গদ্যের বিকাশ, শিক্ষা ও সমাজসংস্কার, সমাজে যুক্তিবাদের প্রসার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বশক্তি নিয়ে আজীবন তিনি বিদ্যাসাগরের পাশে ছিলেন।

ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তাগত যে প্রভাব অক্ষয় দত্তের মননে প্রথম দিকে ছিল, বিদ্যাসাগরের সাথে যোগাযোগ এবং আলাপ-আলোচনার সূত্রে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই, ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে থেকেও অক্ষয় দত্ত লিখেছিলেন, প্রার্থনা নয়, পরিশ্রমেই মুক্তি। কৃষকরা পরিশ্রম করে শস্য পায়, প্রার্থনা করে নয়। জীবনযাপনের জন্য যা যা প্রয়োজন, দেখা যাচ্ছে সেসবই একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়েই উৎপাদন করা সম্ভব। তা হলে,

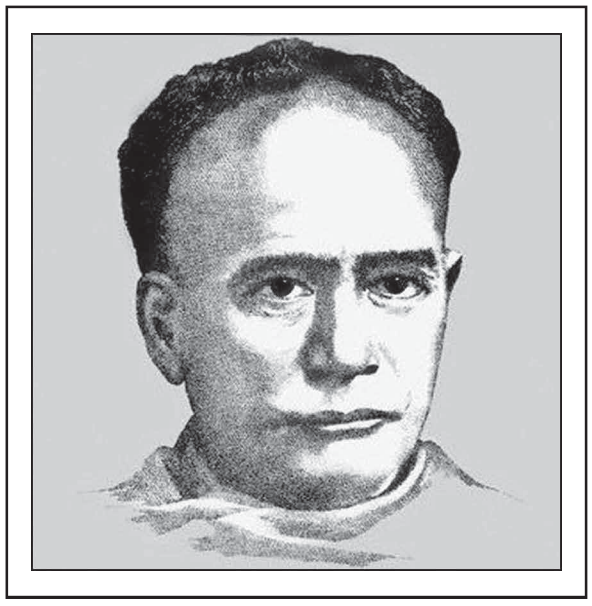

পরিশ্রম = ফসল
পরিশ্রম + প্রার্থনা = ফসল
অতএব, প্রার্থনা = শূন্য (০)

এইসব চিন্তাভাবনা স্বভাবতই ব্রাহ্ম সমাজের কেন্দ্রীয় ভাবাদর্শের বিপরীত ছিল। তাই, ঠিক হল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপার জন্য একটি 'লেখা-নির্বাচন কমিটি' বা 'পেপার কমিটি' তৈরি করা হবে এবং এই কমিটির অনুমোদন না নিয়ে কোনও লেখা প্রকাশ করা যাবে না, এমনকি পত্রিকা-সম্পাদকেরও না। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন তিনি যেন সেই কমিটির সদস্য হন। বিদ্যাসাগরের সাথে ব্রাহ্ম সমাজের কাজকর্মের কোনও সম্পর্ক ছিল না। অক্ষয় দত্তের বিশেষ অনুরোধে তিনি রাজি হন এবং অন্যান্য সদস্যরা অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ওই 'পেপার কমিটি'র বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে মেনে নেন। এর পর থেকে অক্ষয় দত্ত নিজের লেখাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করার আগে বিদ্যাসাগরকে দেখতে দিতেন এবং বিদ্যাসাগর তাঁর নানা ব্যস্ততার মধ্যেও গভীর মনোযোগ দিয়ে সেগুলির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিতেন। এই সম্পাদনাগুলির দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ইত্যাদির সূক্ষ্মতা এবং তীক্ষ্ণতায় শুধু অক্ষয় দত্ত নন, 'পেপার কমিটি'র অন্যান্য সদস্যরাও অত্যন্ত আশ্চর্য হতেন। কমিটির সদস্য শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় একটি চিঠিতে লিখেছেন, "The corrections and alterations made by Iswar Chandra Vidyasagar here and there have been very nice."

১৮৫১ সালে অক্ষয় দত্ত একটা বই প্রকাশ করলেন, 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। এ-বই সে সময়ের নিরিখে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। অক্ষয় দত্তের মনন জগতের এহেন অবস্থান দেখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কী সম্বন্ধ। আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কী সম্বন্ধ। আকাশ-পাতাল প্রভেদই বটে।' তারপর অক্ষয় দত্ত প্রকাশ করলেন 'চারুপাঠ' (১৮৫৩)। এই বইয়ের প্রথম ভাগ-এ তিনি লিখলেন, "...জন্তুর ন্যায় কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের ধর্ম্ম নয়।... আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের চিন্তা করা যেরূপ আবশ্যক, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া, স্বদেশের দুঃখ-বিমোচন ও সুখ সম্পাদনার্থ যত্ন ও চেষ্টা করাও সেইরূপ আবশ্যক।" এইসব বইগুলিকে ছাত্রদের পাঠ্য তালিকায় দিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি বলেছিলেন 'সাংখ্য-বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন।' অক্ষয় দত্ত এ নিয়ে গভীর পড়াশুনা করেছিলেন এবং ব্রাহ্ম সভায় দাঁড়িয়েই তিনি বলেছিলেন 'বেদ অপৌরুষেয় নয় এবং সে কারণে অভ্রান্তও নয়।' বেদের নানা বিষয় নিয়ে তিনি অত্যন্ত সাহসী লেখা লিখেছেন। এক বেদের মুনি-ঋষির সাথে অন্য বেদের মুনি-ঋষিদের অত্যন্ত তিক্ত-বিষাক্ত বাদানুবাদের দৃষ্টান্ত তুলে এনে তিনি প্রকাশ করেছেন। দেখিয়েছেন, শতপথ ব্রাহ্মণে কীভাবে শুক্লরা (শ্বেতবর্ণেরা) কৃষ্ণদের (কালোদের) গালাগাল করেছেন। একই ভাবে সাম বেদের সাধুরা ঋক বেদের সাধুদের বিরুদ্ধে কীভাবে বিষোদগার করেছেন। ধর্ম কী বীভৎসভাবে মানবতাকে আক্রমণ করেছে, তাও তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন অক্ষয় দত্ত। সারনাথের বৌদ্ধদের কী নৃশংসভাবে হিন্দুরা হত্যা করেছিল এবং তাদের সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল, সেসবও তিনি লিখেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ধর্ম আজ আর মানুষকে প্রগতির রাস্তা দেখাতে পারে না।

তখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন নিয়ে তোলপাড় তুঙ্গে। বিদ্যাসাগরের সামনে পর্বতপ্রমাণ বিরোধিতা। দক্ষ সেনাপতির মতো সমস্ত আক্রমণকে ঠেকাবার, চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য বিদ্যাসাগর দিন-রাত উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন। বিধবাবিবাহের পক্ষে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ইত্যাদি জোগাড় করে, তার ব্যাখ্যা-টীকা সহ সম্পাদনা করে তিনি ১৮৫৫ সালে লিখলেন, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৩৯ সংখ্যায় সে বক্তব্য প্রকাশ করেন অক্ষয় দত্ত। শুধু তা-ই নয়, সে বক্তব্যের সমর্থনে অসুস্থ শরীর নিয়েও পরের সংখ্যায় অক্ষয় দত্ত লিখেছিলেন এক সুদীর্ঘ এবং জোরালো প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরের বক্তব্য জনসাধারণের মনে কী বিপুল প্রভাব ফেলেছে তার বিস্তারিত বিবরণ সহ আরও নানা দিক বিশ্লেষণ করেন।

বিদ্যাসাগরের লেখার জবাবে যেসব বিরুদ্ধ যুক্তি তখন উঠেছিল, সেসবের জবাব দিয়ে বিদ্যাসাগর ওই বছরই দ্বিতীয় বার প্রকাশ করলেন, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। এই পুস্তিকার সমর্থনেও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পরপর কয়েকটি লেখা প্রকাশ করেন অক্ষয় দত্ত। সমাজমননে প্রভাব ফেলতে সে লেখাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যদিও ব্রাহ্ম সমাজের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ ব্যাপারগুলিতে সম্পূর্ণ খুশি হচ্ছিলেন না। তাঁরা চেয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হবে ব্রাহ্ম মতাদর্শ প্রচারের জায়গা। অথচ তার বদলে চলছে অন্য জিনিস। তাঁরা বলতে শুরু করলেন, 'পত্রিকার মধ্যে কতগুলো নাস্তিক এসে জুটেছে। এরা থাকলে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচার কিছুতেই সম্ভব নয়।' (A bunch of atheists have taken over as the article-editors. Unless these are thrown out, the cause of the Brahmo Religion will not be furthered.) চিন্তা জগতের এই পার্থক্যের কারণে ১৮৫৫ সালের শেষের দিকে তত্ত্ববোধিনী থেকে অবসর নেন অক্ষয় দত্ত। যোগ দেন বিদ্যাসাগরের নর্মাল স্কুলে, অধ্যক্ষ পদে। অক্ষয় দত্ত পত্রিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর বিদ্যাসাগরের সাথেও তত্ত্ববোধিনীর আর তেমন কোনও যোগাযোগ ছিল না। অক্ষয় দত্ত নর্মাল স্কুলের দায়িত্ব নিলেন ঠিকই কিন্তু জটিল রোগের কারণে শরীর ক্রমশ ভেঙে আসছিল তাঁর। বেশি দিন স্কুল চালাতে পারলেন না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বছর তিনেক পর অবসর নিলেন এবং বাকি জীবনটা শারীরিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট করে হলেও জ্ঞানচর্চার মধ্যেই সারাক্ষণ ডুবে ছিলেন।

দীর্ঘকাল প্রায় শয্যাশায়ী থেকে ১৮৮৬ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রয়াত হন। বিদ্যাসাগর তখনও, বৃদ্ধ বয়সেও, পিতা-মাতা-বন্ধু বিয়োগের বেদনা নিয়েও, চির তরুণের উদ্যমে অসংখ্য ঝড়-ঝঞ্ঝা সামলাতে সামলাতে অসংখ্য কর্মসূচিতে প্রবলভাবে সক্রিয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায় পাওয়া যাচ্ছে, তিনি বয়সের ভার উপেক্ষা করে নানা ধরনের নতুন পাঠক্রম লিখছেন, আরও সহজ-সরল ভাষায় কীভাবে সেগুলি প্রকাশ করা যায় তার জন্য নিজে প্রুফ দেখছেন, বারবার নিজের লেখাই কাটছেন। এছাড়া, ১৮৮৫ সালে মেট্রোপলিটন স্কুলের বৌবাজার শাখা স্থাপিত হচ্ছে। পরের বছর কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে মেট্রোপলিটন কলেজ (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ)-এর উদ্বোধন হচ্ছে এবং বিদ্যাসাগর প্রতিনিয়ত তার খুঁটিনাটি দেখাশুনা করছেন।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

অ্যাবেকার যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না বিদ্যুৎমন্ত্রী

১৮ নভেম্বর সল্টলেকের বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্যেই বিদ্যুতের মাশুল সর্বোচ্চ— এই তথ্য তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ৫০ শতাংশ মাশুল কমানোর দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্যাপটিভ খনি থেকে রাজ্য সরকার কয়লা

ব্যবহার করলে, পুলিশ সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শত শত কোটি বকেয়া বিদ্যুৎ মাশুল আদায় করলে, বিদ্যুৎ দপ্তরের দুর্নীতি বন্ধ করে এটিসি লস (সঞ্চালন, কারিগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতি) কমানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিলে ৫০ শতাংশ মাশুল কমানো যায়— নেতৃবৃন্দের এই যুক্তি মন্ত্রী অস্বীকার করতে পারেননি।

রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির কাছে গচ্ছিত গ্রাহকদের সিকিউরিটি ডিপোজিটের টাকার উপর দেয় সুদের হার ৬ শতাংশ। কিন্তু সেই সুদ বৎসরান্তে গ্রাহকদের দেওয়া হয় না। অথচ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া টাকার উপর বাৎসরিক সুদের হার ২৪ শতাংশ, যাকে লেট পেমেন্ট সারচার্জ বা এলপিএসসি বলা হয়। এই বিশাল বৈষম্য ও অন্যায় কেন চলছে, মন্ত্রী তারও জবাব দিতে পারেননি। এলপিএসসি ব্যাঙ্ক রেটের বেশি না করার দাবি জানানো হয় মন্ত্রীকে।

দেশের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যে কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ দাবি করেন অন্তত তিন একর পর্যন্ত কৃষিতে বিনা পয়সায় এবং তদূর্ধ্বে ৫০ শতাংশ কম দামে বিদ্যুৎ দিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের রক্ষা করতে হবে। বন্টন কোম্পানির এলাকার ন্যায় সিইএসসি গ্রাহকদের ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত সরকারি ভর্তুকির দাবি জানানো হয়। জঙ্গলমহল এলাকার বিপুল পরিমাণ ভুতুড়ে বিল সংশোধনের জন্য আবার সার্কুলার জারি করার বিষয়ে মন্ত্রী বন্টন কোম্পানিকে বলবেন বলে জানিয়েছেন।

সাম্প্রতিক বুলবুল ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকাঠামো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সারানো এবং ক্ষতিগ্রস্তদের বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবি জানান নেতৃবৃন্দ। অ্যাবেকার দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে মন্ত্রী সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে সিইএসসি, ডব্লুবিএসইডিসিএল এবং ডব্লুবিইআরসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে শীঘ্রই গ্রাহক স্বার্থে কোন কোন সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন তা জানাবেন বলে অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দকে জানান। সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও প্রতিনিধি দলে ছিলেন অমল মাইতি, অনুকূল ভদ্র, সুব্রত বিশ্বাস, সুভাষ ব্যানার্জী প্রমুখ।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের রাজ্য সম্মেলন

১৮-১৯ নভেম্বর কলকাতার নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের বৃহৎ সংগঠন প্রোগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (পিএমপিএআই) -এর ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন। ১৮টি জেলা থেকে ২১৭৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। দেশের অন্য ৮টি প্রদেশ থেকেও ৪২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় 'সাপের কামড় ও তার চিকিৎসা', 'অস্টিওপোরোসিস', 'ডায়াবেটিস ও তার প্রতিকার' এবং 'অ্যাকিউট হার্ট অ্যাটাক' বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক শিবেন্দু ঘোষ, ডাঃ গৌতম সাহা, ডাঃ পার্থসারথি মণ্ডল ও অধ্যাপক প্রকাশ চন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ প্রখ্যাত শিক্ষক - চিকিৎসকরা।

১৯৮২ সালে জন্মলগ্ন থেকেই পিএমপিএআই মূলত গ্রামীণ নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের নাম নথিভুক্তিকরণ, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে নিয়োগের দাবি জানিয়ে আসছে। ২০১৫ সালে ৬ নভেম্বর বর্তমান রাজ্য সরকার একটি সার্কুলার জারি করে আংশিক হলেও দাবিগুলি স্বীকার করে এবং ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে। যদিও নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া এখনও অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্রও দেওয়া হচ্ছে না এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় সঠিকভাবে নিয়োগের পরিকল্পনা এখনও তৈরি হয়নি। সম্মেলনে এসব নিয়ে আন্দোলন তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত হয়।

সম্মেলন থেকে ৪০ জনের একটি শক্তিশালী রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, ডাঃ রবিউল আলম এবং ডাঃ তিমিরকান্তি দাস। সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৫ জনের একটি সর্বভারতীয় প্রস্তুতি কমিটিও তৈরি হয়েছে। সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তরুণ মণ্ডল। তিনি আন্দোলনকে আরও জোরদার করে এবং সংগঠনকে আরও বিস্তৃত করে অপূরিত দাবিগুলি আদায় করার জন্য প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান জানান।

জেএনইউ-এর আন্দোলনের সমর্থনে ডিএসও

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নেমেছেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আন্দোলন ভাঙতে ক্যাম্পাসে ঢুকে পুলিশ বেপরোয়া আক্রমণ চালায় ছাত্রছাত্রীদের উপর। এই জঘন্য ঘটনার প্রতিবাদে গোটা দেশের ছাত্রসমাজ জেএনইউ-এর পাশে দাঁড়িয়েছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র সদস্যরাও।

হরিয়ানার রোহতকে ২০ নভেম্বর এআইডিএসও সহ অন্য কয়েকটি ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ সমাবেশ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। সমাবেশে এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক উমেশ কুমার ও রাজ্য সহসভাপতি রাজেশ কুমার বলেন, শিক্ষাকে মহার্ঘ পণ্যে পরিণত করার যে চক্রান্ত দেশ জুড়ে চলছে জেএনইউ-এর ঘটনা তারই অঙ্গ। সরকার চায় শিক্ষার দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে।

অন্যান্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং এলাকাতেও ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং জেএনইউ আন্দোলনের সমর্থনে, তাতে পুলিশের ঘৃণ্য ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদে ডিএসও-র পক্ষ থেকে সভা-মিছিল-গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ইত্যাদি চলছে। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জেএনইউ আন্দোলনের সমর্থনে ও গুজরাট সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে স্বাক্ষর সংগ্রহে অংশ নেন। কর্তৃপক্ষ ভয় দেখিয়ে বলে, 'এখনই এসব বন্ধ করতে হবে, না হলে পুলিশ ডাকব।' ডিএসও-র সদস্যরা অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি জানান, সরকারের প্রশাসনিক সচিব তাঁকে ফোন করে স্বাক্ষর সংগ্রহ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। ডিএসও নেত্রী রিমি বাঘেলা বলেন, 'দু'দিন আগে কলেজে এক ছাত্র আত্মহত্যা করেছে। সে নিয়ে অধ্যক্ষ বা সচিবকে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায় না, অথচ এই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির বিরুদ্ধে তাঁরা 'সক্রিয়' হয়ে উঠেছেন। এতে তাদের স্বরূপই প্রকাশিত হচ্ছে।'

ছবি ঃ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ওড়িশায় ডিএসও-র বিক্ষোভ

ওড়িশার ম্যাট্রিক বোর্ডের পরীক্ষার ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৫ নভেম্বর কটকে বিএসই অফিসের সামনে ডিএসও-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com